ইউনিট ১ বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

ভূমিকা

শিক্ষা একটি চলমান প্রক্রিয়া। সময়ের প্রয়োজনে শিক্ষার ধারণা, বিষয়বস্তু শিক্ষাদান প্রক্রিয়া পরিবর্তিত হয়। বহু যুগের ক্রমান্বিত প্রচেষ্টার ফলে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার বহু উত্তরণ ঘটেছে। কাজেই বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার ইতিহাস সম্পর্কে জানতে হলে ইতিহাসের পথ বেয়ে বহু পিছনে ফিরে যাওয়া প্রয়োজন। শিক্ষার এই ইতিহাস মোটামুটিভাবে জানার জন্য এখানে কয়েকটি কালের নিরিখে তা উপস্থাপনের চেষ্টা করা হল। এই কালগুলো হচ্ছে: প্রাক-ব্রিটিশ ও ব্রিটিশ আমল, পাকিস্তান আমল এবং বাংলাদেশ আমল।

আলোচনার সুবিধার্থে এই ইউনিটটিকে মোট পাঁচটি পাঠে ভাগ করা হয়েছে। এই পাঠগুলো হচ্ছে:

পাঠ- ১.১: প্রাক-ব্রিটিশ আমলে ভারতীয় উপমহাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা

পাঠ- ১.২: ব্রিটিশ আমলে ভারতীয় উপমহাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি

পাঠ- ১.৩: পাকিস্তান আমলে প্রাথমিক শিক্ষা

পাঠ- ১.৪: বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা: বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

পাঠ- ১.৫: বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা: বিশেষ দিকসমূহ

পাঠ ১.১

প্রাক-ব্রিটিশ আমলে ভারতীয় উপমহাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- প্রাক-ব্রিটিশ আমলে ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা বর্ণনা করতে পারবেন;
- উল্লিখিত সময়কালে প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষার বিশেষ দিকগুলো নির্দেশ করতে পারবেন;
- তখনকার প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

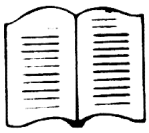

প্রাক-ব্রিটিশ আমলে ভারতীয় উপমহাদেশে শিক্ষা বলতে অবিভক্ত ভারতের প্রাথমিক শিক্ষার ইতিহাসকেই বুঝিয়ে থাকে। ইতিহাস পাঠে জানা যায় সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং ধন সম্পদের দিক থেকে এ উপমহাদেশ ঐশ্বর্যশালী ছিল। ফলে দ্রাবিড়, হ ন, আর্য, মঙ্গোলিয়া, তুর্কী, পাঠান, মুঘল, ইংরেজ প্রভৃতি জাতির ভারতে আগমন, বসবাস ও শাসন করেছে বহু যুগ যুগ ধরে। আনুমানিক ৩০০০ বছরেরও পূর্ব প্রাচীন ভারতে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার সূত্রপাত ঘটে। প্রাচীন ভারতের এই শিক্ষাব্যবস্থা ছিল ধর্মকেন্দ্রিক। তাই ধর্মের ভিত্তিতে এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। (১) বৈদিক শিক্ষা, (২) বৌদ্ধ শিক্ষা এবং (৩) মুসলিম শিক্ষা। প্রাচীন ভারতের এই তিন শ্রেণীর শিক্ষার বৈশিষ্ট্য, বিষয়বস্তু এবং শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে এখানে আলোকপাত করা হল।

বৈদিক শিক্ষা

বেদ হিন্দুদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। এটি সংস্কৃত ভাষায় রচিত। বেদ শব্দের অর্থ জ্ঞান। বৈদিক চিন্তাধারা ও দার্শনিক মতবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত এই শিক্ষাব্যবস্থা 'ব্রাহ্মণ্য' শিক্ষা নামে অভিহিত। ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ব্যবস্থায় বর্ণ বৈষম্য ছিল প্রকট। ফলে এ শিক্ষা সর্বজনীন না হয়ে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকেন্দ্রিক হয়ে উঠে। এ ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণ বালকেরা উচ্চতর জ্ঞান লাভের সুযোগ পেত। ক্ষত্রিয় বালকেরা রাজগৌরব বা যুদ্ধবিদ্যা লাভ করত। অন্যদিকে, বৈশ্য বালকেরা কৃষি ও ব্যবসার বিষয়ে শিক্ষা লাভ করত। শিক্ষার্থীর ৫ বছর বয়সে "স্বীকরনম" অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শিক্ষা শুরু হতো।

বৈদিক শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ব্রাহ্মণ শিশুদের পুরোহিত করে গড়ে তোলা। শিক্ষকরা সকলেই ছিলেন ব্রাহ্মণ। বৈদিক শিক্ষার মাধ্যম ছিল সংস্কৃত। পুরো শিক্ষাই ছিল গুরুকেন্দ্রিক, শিক্ষাগুরুই শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাসূচি নির্ধারণ করতেন। ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ব্যবস্থায় তিন ধরনের বিদ্যালয় ছিল। বিদ্যালয়গুলো পরিষদ, টোল ও পাঠশালা নামে পরিচিতি লাভ করে। প্রাচীন ব্রাহ্মণরা পরিষদের, তরুণ ব্রাহ্মণরা টোলে এবং আদিম অধিবাসী ও শ দ্র সম্প্রদায় ছাড়া সকলেই পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভের সুযোগ পেত।

পাঠশালায় পড়া লেখা, গণনা এবং পৌরাণিক কাহিনী পড়ানো হত। পাঠশালার শিক্ষকরা ছিলেন ব্রাহ্মণ। তারা কোন বেতন পেতেন না। পূজা পার্বণে দক্ষিণা এবং ফসল উঠার সময় তিনি ফসলের একটি বিশেষ অংশ পেতেন।

বৌদ্ধ শিক্ষা

গৌতম বুদ্ধের অহিংসনীতির ভিত্তিতে বৌদ্ধ শিক্ষার আবির্ভাব ঘটে। নির্বাণ লাভ বৌদ্ধ ধর্মের শেষ লক্ষ্য। অষ্টমা বা অষ্টপন্থায় নির্বাণ লাভ ছিল বৌদ্ধ শিক্ষার মূল কথা। সৎ চিন্তা, সৎ বাক্য, সৎ

বিশ্বাস, সৎ উপার্জন, সৎধ্যান, সৎ প্রচেষ্টা ও সৎ স্মৃতি হচ্ছে অষ্টমার উপাদান। শিক্ষার মাধ্যমে অষ্টমা চর্চা এবং তা ব্যক্তি জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে দুঃখময় পৃথিবী থেকে নির্বাণ বৌদ্ধ শিক্ষার লক্ষ্য।

শিশুর ছয় বছর থেকে শিক্ষা শুরু হত এবং চৌদ্ধ বছর বয়স পর্যন্ত চলত। গল্পের মাধ্যমে বাস্তব উদাহরণ দিয়ে সাধারণত মুখে মুখে ধর্ম শিক্ষা দেওয়া হত। মাঝে মাঝে আলোচনা ও বিতর্ক সভারও আয়োজন করা হত। গণতন্ত্র ছিল বৌদ্ধ শিক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য। শিক্ষার দ্বার সকলের জন্য খোলা ছিল।

মুসলিম শিক্ষা

মুসলিম শাসনামলে প্রাথমিক শিক্ষা ছিল মসজিদ কেন্দ্রিক। মসজিদগুলো মক্তব হিসেবে ব্যবহৃত হত। চার বছর বয়সে শিক্ষার্থীকে আনুষ্ঠানিকভাবে কলেমা পাঠের মাধ্যমে মক্তবে ভর্তি হতে হত। নামায পাঠের জন্য মক্তবে প্রয়োজনীয় সুরা কেরাত শিক্ষা দেওয়া হত। মূল পাঠ শুরু হত ৭ বছর বয়সে। মক্তবে কুরআন শিক্ষাই ছিল প্রধান। এর পাশাপাশি পড়া, লেখা ও সাধারণ হিসাব নিকাশও শিক্ষা দেয়া হত। মসজিদের ইমামগণ মক্তবে শিক্ষকতার কাজ করতেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.১

অ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা কি?
২. আনুমানিক কত বছর পূর্বে ভারতে আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার সূত্রপাত ঘটে?
৩. প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার মূল ভিত্তি কি ছিল?
৪. কৃষি ও ব্যবসায় বিষয়ে শিক্ষালাভ কোন বর্ণের মানুষের জন্য নির্দিষ্ট ছিল?
৫. বৈদিক আমলের পাঠশালায় কি কি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হত?
৬. নির্বাণ লাভ কোন ধর্মের প্রধান লক্ষ্য ছিল?
৭. অষ্টমার উপাদানগুলো কি কি?
৮. বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থায় দশ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুকে কি কি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার রেওয়াজ ছিল?
৯. কোন প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে মুসলিম আমলে প্রাথমিক শিক্ষা গড়ে উঠে?
১০. মক্তবে প্রধানত কি শিক্ষা দেওয়া হত?
১১. কুরআন শিক্ষার পাশাপাশি মক্তবে আর কি কি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হত?
১২. কারা মক্তবের শিক্ষক হিসেবে কাজ করতেন?

আ) শূন্যস্থান পূরণ করুন

১. প্রাচীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা ছিল ..... কেন্দ্রিক।
২. বেদ শব্দের অর্থ .....।
৩. শিশুর ৫ বছর বয়সে .....অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বৈদিক শিক্ষা শুরু হত।
৪. .....লাভই বৌদ্ধ শিক্ষার লক্ষ্য ছিল।
৫. বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থায় .....চর্চার মাধ্যমে নির্বাণ লাভ সম্ভব বলে মনে করা হত।
৬. .....পাঠের জন্য মক্তবে সুরা, কেরাত শিক্ষা দেওয়া হত।
৭. মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থায় মূল পাঠ শুরু হত শিশুর .....বছর বয়সে।

পাঠ ১.২ ব্রিটিশ আমলে ভারতীয় উপমহাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থার পটভূমি বর্ণনা করতে পারবেন;
- প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ তুলে ধরতে পারবেন এবং
- প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে বৃটিশ শাসকদের গৃহীত ব্যবস্থা ও প্রচেষ্টার বিবরণ দান করতে পারবেন।

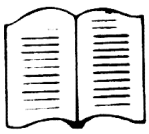

বণিকরূপে এসে ব্রিটিশরা ১৭৫৭ সালে এদেশের শাসনক্ষমতা দখল করে। শাসনকাজ পরিচালনার জন্য পাশ্চাত্য শিক্ষার মাধ্যমে দেশীয় একটি তাবেদার জনগোষ্ঠী সৃষ্টির তখন একান্ত প্রয়োজন হয়, যাঁরা ভারতীয় হয়েও রুচি, সংস্কৃতি ও নৈতিকতায় হবেন ইংরেজ এবং তাঁরাই প্রকৃতপক্ষে এদেশ শাসন করবেন। শাসকগোষ্ঠীর এই মনোভাব থেকে বুঝা যায় ব্রিটিশরা ভারত ও ভারতীয়দের উন্নয়নের প্রতি মোটেও যত্নবান ছিল না। এই নীতির ফলে হাজার হাজার বছরের প্রচেষ্টায় গড়ে উঠা দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা ক্রমশ বিলুপ্ত হতে থাকে।

এডামের রিপোর্ট

ভারতে প্রচলিত দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন সাধনের জন্য স্যার এডামসের নেতৃত্বে ১৮৩৫, ১৮৩৬ এবং ১৮৩৮ সালে সম্পাদিত ৩টি জরিপ রিপোর্টে দেখা যায়, তৎকালে বাংলা ও বিহারে সাধারণ ও পারিবারিকসহ ১ লক্ষ প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। জনসংখ্যার অনুপাতে প্রতি ৪০০ জন মানুষের জন্য একটি বিদ্যালয় ছিল।

দেশীয় বিদ্যালয়গুলো স্থানীয় বিত্তবানদের আর্থিক সহায়তা ও দান-দক্ষিণায় চলত। শিক্ষকরা ৪-১০ টাকা পর্যন্ত বেতন পেতেন। এ সব বিদ্যালয়ে উচ্চ শ্রেণীর ছাত্ররা নিম্নশ্রেণীর শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানে সহায়তা করত। এ পদ্ধতি 'মনিটরিয়াল পদ্ধতি' নামে ইংল্যান্ডে খ্যাতি লাভ করে। ড. বেল এই শিক্ষাদান পদ্ধতি ইংল্যান্ডে প্রবর্তন করেছিলেন।

দেশীয় এই শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কার ও উন্নয়নের মাধ্যমে এ দেশের জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় রূপান্তর সম্ভব বলে এডাম বিশ্বাস করতেন। তাই দেশী শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে তিনি কতিপয় সুপারিশও রিপোর্টে উল্লেখ করেন। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের উপযোগী পাঠ্যপুস্তক মাতৃভাষায় রচনা, প্রতি জেলায় একজন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক এবং শিক্ষকদের বসবাসের জন্য জমি প্রদান ইত্যাদি এ সুপারিশগুলোর অন্যতম ছিল।

লর্ড মেকলের বিরোধিতার কারণে দেশীয় শিক্ষার উন্নয়ন সম্ভব হয়নি।

উডের ডেসপ্যাচ

ব্রিটিশ আমলে লর্ড ময়রা, লর্ড হার্ডিঞ্জ এবং লর্ড ডালহৌসি যথাক্রমে ১৮১৫, ১৮৪৪ ও ১৮৫৩ সালে বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের জন্য কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এ সময়ে বাংলাদেশে ১০০টি ভার্নাকুলার বিদ্যালয় এবং কলিকাতায় একটি নর্মাল স্কুল ও তৎসংলগ্ন একটি আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছিল। এ সব তৎপরতার মধ্যে এ দেশের শিক্ষার প্রসারকল্পে ১৯৫৪ সালে উডের ডেসপ্যাচ নামে একটি শিক্ষা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এই

ডেসপ্যাচের সুবাদে ১৮৫৫ সালে ভারতের ৫টি বিভাগে শিক্ষা বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিভাগের প্রধান ছিলেন একজন জনশিক্ষা পরিচালক। ১৯৮০ সাল পর্যন্ত এই ঐতিহ্যবাহী পদটি বাংলাদেশে বিদ্যমান ছিল। উডের এই ডেসপ্যাচ অনুসারে দেশে বহু মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছিল। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপরে ডেসপ্যাচে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ফলে ১৮৫৭ সালে ঢাকায় ১টি এবং ১৮৬৯ সালে চট্টগ্রামে ১টি নর্মাল স্কুল স্থাপিত হয়। নর্মাল স্কুলে বিভিন্ন মেয়াদে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়া শুরু হয়।

হাণ্টার কমিশন ও লর্ড কার্জনের শিক্ষা সংস্কার

ব্রিটিশ ভারতের শিক্ষার উন্নয়ন ও বিস্তারের জন্য উইলিয়াম হাণ্টারের নেতৃত্বে প্রথম শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়। ভারতীয় ও ইংরেজ মিলে এই কমিশনে ২২ জন সদস্য ছিলেন। ১৮৮৩ সালে কমিশন তার রিপোর্ট পেশ করে। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এই কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ ছিল নিম্নরূপ:

১. সরকার কর্তৃক কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের পরিবর্তে বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়কে সহযোগিতা প্রদান করতে হবে।
২. স্থানীয় প্রশাসনের অধীনে স্কুল বোর্ড গঠন করে প্রাথমিক শিক্ষার সকল দায়িত্ব তার ওপর অর্পণ করতে হবে।
৩. শিক্ষাখাতে বরাদ্দের ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় মিটাতে জেলা ও মিউনিসিপ্যাল বোর্ডে আলাদা অর্থ ভান্ডার সৃষ্টি করতে হবে। সরকার এ ব্যাপারে সাহায্য করবে।
৪. স্বায়ত্তশাসিত বোর্ডগুলোকে প্রাথমিক শিক্ষাখাতে তাদের সমগ্র ব্যয়ের এক তৃতীয়াংশে ব্যয় করতে হবে।
৫. প্রাথমিক শিক্ষা শিখনের সকল ব্যয় সরকারকে বহন করতে হবে। এজন্য প্রতি মহকুমায় মহকুমা পরিদর্শকের তত্ত্বাবধানে একটি করে শিক্ষক শিখন স্কুল থাকবে।
৬. দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনে শিক্ষাক্রমে দেশীয় গণিত, হিসাব নিকাশ, জমি জরিপ, সাধারণ বিজ্ঞান, স্বাস্থ্যতত্ত্ব অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

লর্ড কার্জনের শিক্ষা সংস্কার

১৯০১ সালে লর্ড কার্জন শিমলা সম্মেলনের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার সংস্কারের জন্য বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। তার উল্লেখযোগ্য কাজগুলো ছিল:

- প্রাথমিক শিক্ষার খরচের এক তৃতীয়াংশের পরিবর্তে সরকারের অর্ধাংশ ব্যয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান।
- শহর ও গ্রামাঞ্চলের জন্য আলাদা শিক্ষাক্রম প্রণয়ন।
- ফলভিত্তিক সরকারী অনুদান বিলোপ করে স্কুলভিত্তিক অনুদান প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিদ্যালয়গুলোকে এককালীন ও পৌনপুনিক অনুদান প্রদানের ব্যবস্থা করা।

শিক্ষা সম্প্রসারণ বিষয়ক এক জরিপ রিপোর্টে দেখা যায় ১৯০১-১৯০২ সাল পর্যন্ত সময়ে ভারতে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা ছিল ৮৩০০০। আবার ১৯১১-১৯১২ সাল পর্যন্ত সে সংখ্যা ১,১৮,০০০ এরও বেশি হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর শিক্ষা ব্যবস্থায় ৪০ বছর ব্যাপী একটি পরিকল্পনা জন সার্জেন্টের নেতৃত্বে রচিত হয়। এতে ছয় বছরের কম বয়সী শিশুদের নার্সারী স্কুল এবং ৬-১৪ বয়সীদের জন্য অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার সুপারিশ ছিল। কিন্তু এই রিপোর্ট বাস্তবায়নের পূর্বেই ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ ভেঙ্গে পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটি পৃথক স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.২

অ) শুদ্ধ হলে 'শু' এবং ভুল হলে 'ভু' লিখুন:

১. ব্রিটিশদের সহায়তায় দেশীয় বিদ্যালয়গুলোর সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

২. এডামের রিপোর্টে জানা যায় এদেশে একদা প্রতি ৪০০ জন মানুষের জন্য একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল।

৩. উডের ডেসপ্যাচের সুবাদে ভারতের ৫টি বিভাগের প্রতিটিতে একজন করে জনশিক্ষা পরিচালক ছিলেন।

৪. হাণ্টার কমিশনের সকল সদস্যই ইংরেজ ছিলেন।

৫. লর্ড কার্জন মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন।

আ) শূন্যস্থান পূরণ কর:

১. বাংলা ও বিহারে মোট .....দেশীয় প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল।

২. ১৮৫৭ সালে ঢাকায় ১টি এবং ১৮৬৯ সালে চট্টগ্রামে একটি .....স্কুল স্থাপন করা হয়।

৩. ১৯১১-১৯১২ সালে ভারতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়ায় ..... ।

৪. জন সার্জেন্ট .....বয়সী শিশুদের জন্য অবতৈনিক শিক্ষার সুপারিশ করেন।

পাঠ ১.৩ পাকিস্তান আমলে প্রাথমিক শিক্ষা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- পাকিস্তান আমলের প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা বর্ণনা করতে পারবেন;
- পাকিস্তানে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার ও উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ উল্লেখ করতে পারবেন;
- গৃহীত পদক্ষেপের ফলাফল বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

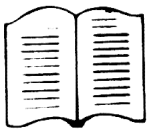

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের ফলে ভারত ও পাকিস্তান -এ দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। বর্তমান বাংলাদেশ ভূখন্ড তখন পূর্ব পাকিস্তান নামে পাকিস্তানের একটি প্রদেশ হলেও জনসংখ্যার দিক থেকে ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে জাতীয় প্রয়োজনে পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার ও পুনর্গঠন তখন একান্তভাবে প্রয়োজন হয়। এ উদ্দেশ্যে ১৯৪৭ সালে করাচীতে প্রথম পাকিস্তান শিক্ষা অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে পাকিস্তানের প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এতে কতিপয় মৌলিক বিষয় ছাড়া প্রাদেশিক সরকারকে শিক্ষা বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান করা হয়। ১৯৫১ সালে মাওলানা আকরাম খানের নেতৃত্বে ১০ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করে ১৯৫২ সালে কমিটি প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে যে সকল সুপারিশ করেন তার মধ্যে নিম্নবর্ণিতগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আকরাম খান কমিটির সুপারিশঃ

১. প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন মুহকুমা পর্যায়ে বিন্যাস করা হোক, প্রতি মুহকুমায় একজন মুহকুমা/শিক্ষা অফিসার নিয়োগ করা হোক।

২. প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা হোক।

৩. প্রতিটি থানায় সাব ইন্সপেক্টর অব স্কুলস এর পরিবর্তে এটেনডেন্স অফিসার নিয়োগ করা হোক।

৪. প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হোক।

৫. প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মহিলা শিক্ষিকা নিয়োগ করা হোক।

৬. প্রাথমিক শিক্ষকদের যোগ্যতা ন্যূনতম প্রবেশিকা পাশ সহ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হতে হবে।

৭. শিক্ষক প্রশিক্ষণের মেয়াদ ২ বছর হবে এবং প্রশিক্ষণ কোর্সে তাত্ত্বিক বিষয় অপেক্ষা ব্যবহারিক কাজের ওপর বেশি জোর দিতে হবে।

৮. স্কুল ব্যবস্থাপনায় ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধিত্ব থাকতে হবে।

আকরাম খান কমিশনের বেশ কিছু সুপারিশ পরবর্তী সময়ে বাস্তবায়িত হয়েছে।

১৯৫২ সালের পর অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ১০ বছর মেয়াদি একটি প্ররিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এই পরিকল্পনা অনুসারে প্রতি বছর গ্রামাঞ্চলে ২৫০০টি করে ১০ বছরে ২৫০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের কাজ শুরু হয়। ১৯৫২ সালেই পূর্বপাকিস্তানে ৫০৫৮টি অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক বিদ্যালয় চালু হয়। আবার ১৯৫২ সালেই সারা দেশে ৫ বছর মেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অভিন্ন শিক্ষাক্রম চালু করা হয়।

আতাউর রহমান খান শিক্ষা কমিশন

১৯৫৪ সালে জনাব আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে পূর্বপাকিস্তানের শিক্ষার উন্নয়নে আর একটি কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশন পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা সংস্কার কমিশন '৫১' এর ওপর বিশেষ জোর দেয়। এই কমিশন ৬-১৫ বছর বয়সী ছেলে-মেয়েদের ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার পক্ষে মত প্রকাশ করে। স্কুলের শ্রেণী ও সেকশন অনুপাতে শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশ করে। শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুসারে বেতন প্রদান এবং প্রশিক্ষণের মেয়াদ ১ বছরের স্থলে ২ বছরের প্রস্তাব করা হয়।

এদিকে প্রাদেশিক সরকার এক অর্ডিনান্স বলে ১৯৫৯ সালের ১৮ আগস্ট বাধ্যতামূলক বিদ্যালয়গুলোকে মডেল স্কুলে পরিণত করেন। এ সময়ে সাব-ইন্সপেক্টার অব স্কুলের পরিবর্তে সার্কেল এডুকেশন অফিসার এর পদ সৃষ্টি করা হয়।

শরীফ কমিশন

পাকিস্তানের সামরিক প্রেসিডেন্ট আয়ুব খান দেশের ক্ষমতায় এসে ১৯৫৮ সালে জনাব এম এ শরীফকে চেয়ারম্যান করে জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। কমিশন ১৯৬০ সালে তার রিপোর্ট পেশ করেন। এই রিপোর্টে ৮ বছর মেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করা হয়। কিন্তু পাকিস্তান সরকার পূর্বপাকিস্তানের প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার ও উন্নয়নে কোন সময়ই আন্তরিক ছিল না। যে জন্য প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে যে সকল সুপারিশ করে তার কোনটিই বাস্তবায়ন করা হয়নি। ইতিমধ্যে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্ম হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৩

অ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্নঃ

১. কোন শিক্ষা কমিশন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মহিলা শিক্ষিকা নিয়োগের সুপারিশ করেন?
২. আকরাম খান শিক্ষা কমিশন প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষকদের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা কি নির্ধারণ করেন?
৩. কত সালে সারা দেশে ৫ বছর মেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অভিন্ন শিক্ষাক্রম চালু করা হয়?
৪. ৮ বছর মেয়াদি বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের সুপারিশ কোন শিক্ষা কমিশন করে?
৫. কোন কমিশন শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতানুসারে বেতনের সুপারিশ করে?

আ) সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিনঃ

১. আকরাম খান শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়
ক.১৯৫০ সালে
খ. ১৯৫১ ,,
গ. ১৯৫২ ,,
ঘ. ১৯৫৩ ,,।

২. প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সে তাত্ত্বিক বিদ্যার চেয়ে ব্যবহারিক কাজের ওপর অধিক জোর দেয়ার কথা বলা হয়।
ক. হাণ্টার
খ. আকরাম খাঁন
গ. আতাউর রহমান খান
ঘ. শরীফ।

৩. আতাউর রহমান শিক্ষা কমিশন প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ এক বছর মেয়াদের স্থলে কত বছর মেয়াদের সুপারিশ করেছিল?
ক. ২ বছর
খ. ৩ বছর
গ. ৪ বছর
ঘ. ৫ বছর।

৪. প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে কখন মডেল স্কুলে রূপান্তর করা হয়?
ক. ১৯৫৯
খ. ১৯৬৯
গ. ১৯৪৯
ঘ. ১৯৩৯।

৫. শরীফ কমিশন রিপোর্ট পেশ করেন কত সালে?
ক. ১৯৫৮ সালে
খ. ১৯৫৯ ,,
গ. ১৯৬০ ,,
ঘ. ১৯৬১ ,,।

পাঠ ১.৪ বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা: বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের অভ্যুদয়কালে প্রাথমিক শিক্ষার একটি চিত্র উপস্থাপন করতে পারবেন;
- প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন ও বিকাশে ড. কুদরাত-এ-খুদা কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশগুলো বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে গৃহীত কার্যাবলি এবং প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন কাঠামোর বিভিন্ন স্তরসমূহ নির্দেশ করতে পারবেন।

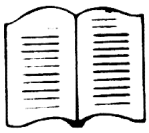

যে কোন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান উপাদান হল ঃ ছাত্র, শিক্ষক, বিদ্যালয়, শিক্ষাক্রম এবং প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা। বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার একটি ধারণা পেতে হলে এই উপাদানগুলো সম্পর্কে জানা একান্ত প্রয়োজন। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে কিভাবে এই উপাদানগুলো সৃষ্টি হয়েছে এবং এগুলোর বিকাশ ঘটেছে তার একটি তথ্যচিত্র এখানে পাওয়া যাবে।

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার বিকাশের ধারা ও বর্তমান অবস্থা

বাংলাদেশের বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা আমরা পাকিস্তান থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছি। বিশ্বের শিক্ষার ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, আজকের উন্নত দেশগুলোতে প্রথমে প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি স্থাপিত হয় এবং পরবর্তীতে সেখানে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার বিস্তার ঘটে। কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে ঘটে ঠিক তার বিপরীতটি। অর্থাৎ ভিত্তিস্তর থেকে শীর্ষ না হয়ে হয়েছে শীর্ষ থেকে ভিত্তিস্তর এর ধারায়। একসময় বাংলাদেশ (তদানিন্তন পূর্বপাকিস্তান) ছিল পাকিস্তানীদের একটি কলোনী। শাসন ও শোষণই ছিল পাকিস্তানীদের প্রধান উদ্দেশ্য। পাকিস্তানী শোষক গোষ্ঠির নিষ্ঠুর শাসন ও তাদের সুবিধাভোগী চক্রের সীমাহীন শোষণ ও প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রাম এবং সর্বশেষ ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ সৃষ্টি হয়। পাকিস্তানী আমলে প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি চরম অবহেলার কারণে এ অঞ্চলে সাধারণ মানুষের শিক্ষার হার কখনই ২০% এর ওপরে উঠেনি। বিপুল সংখ্যক নিরক্ষর জনগোষ্ঠিকে নিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন যে সম্ভব ছিল না এ সত্য উপলব্ধি করেই ১৯৭২ সালে দেশের সংবিধানে প্রাথমিক শিক্ষালাভকে জনগণের মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। বাংলাদেশের স্থপতি ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে যে কতিপয় যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তারই ফলে পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার একটি শক্ত ভিত্তি নির্মাণ সম্ভব হয়। এই সিদ্ধান্তগুলোর মধ্যে ছিল দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ ও একটি শিক্ষা কমিশন গঠন। এই দুটি সিদ্ধান্তের ফলেই বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা নানা বিবর্তন ও পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে আজকের অবস্থায় রূপান্তরিত হয়েছে।

অতীতে প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষকগণ ছিলেন সমাজে অবহেলিত একটি সম্প্রদায়। বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের একটি চাকুরী ছিল মাত্র। কিন্তু তার ভবিষ্যতের কোন নিরাপত্তা ছিল না। অবসর

গ্রহণের পর এই শিক্ষকগণকে চরম দারিদ্র্য ও দুর্দশার মধ্য দিয়ে জীবন কাটাতে হত। স্বাধীনতার উষালগ্নে ১৯৭৩ সালে দেশের ৩৬৬৬৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ এবং এসকল বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সরকারী কর্মচারীর মর্যাদা ও সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হয়। শিক্ষকদের চাকুরীর নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে দেশের বিপুল সংখ্যক বিদ্যালয়ের পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা, নিয়ন্ত্রণ ও অর্থায়ন বাংলাদেশ সরকার গ্রহণ করে। অন্যদিকে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের সকল নাগরিককে উৎপাদনমুখী দক্ষ জনসম্পদ রূপান্তর এবং একটি শক্তিশালী জাতি সৃষ্টির লক্ষ্যে শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার এবং আধুনিক জ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে বলীয়ান হবার জন্য সরকারকে পরামর্শ ও দিক নির্দেশ প্রদানে ড. কুদরাত-এ-খুদার নেতৃত্বে ১৯৭২ সালেই বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। ১৯৭৪ সালে কমিশনের রিপোর্টে পেশ করে; এই রিপোর্টে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রদত্ত গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশগুলো নিম্নরূপ:

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কিরূপ হওয়া প্রয়োজন কমিশন তা সুনির্দিষ্ট করে দিয়ে সে সব বাস্তবায়নের যুগোপযোগী পরমার্শ প্রদান করেন। দেশের প্রচলিত ৫ বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষা জাতীয় আশা আকাঙ্খা পূরণে অপর্যাপ্ত হওয়ায় ৮ বছর মেয়াদী শিক্ষা সরকারী ব্যয়ে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার পরামর্শ দেন। তবে বাস্তবায়নের সুবিধার্থে ১৯৮০ সালের মধ্যে ৫ম এবং ১৯৮৩ সালের মধ্যে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের কথা বলেন। একই সঙ্গে কমিশন প্রাথমিক শিক্ষা স্তরের শিক্ষাক্রমের একটি রূপরেখাও স্থির করে দেন এবং তাতে বাংলা, গণিত, ভূগোল, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দ্বিতীয় ভাষা, শরীর চর্চা, কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীত, ধর্ম ও নীতিশিক্ষা হাতের কাজ এবং কৃষি শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করে।

কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী পরবর্তী সময়ে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটি ১৯৭৭ সালে প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাক্রম পুনর্বিন্যাস ও পাঠ্যসূচি প্রস্তুত করে। নতুন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি মোতাবেক শিক্ষাক্রম, শিক্ষক নির্দেশিকা রচনা এবং নতুন কারিকুলাম ও পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার করে শ্রেণীকক্ষে ঠিকভাবে শিক্ষাদানের জন্য পর্যায়ক্রমে শিক্ষকদেরও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ফলে ১৯৭৮ সাল থেকে দেশে নতুন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুসারে শিক্ষাদান শুরু হয়।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মোট শিক্ষার্থীর এক তৃতীয়াংশই ছিল তখন বালিকা। কাজেই বেশি সংখ্যক বালিকা শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয়ে আকর্ষণ করার জন্য এবং দেশে নারী শিক্ষা জোরদার ও সম্প্রসারণের প্রতি কমিশন সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে। অন্যদিকে বিদ্যালয় পরিবেশকে শিশু লালনের উপযোগী করার জন্য অধিক হারে মহিলা শিক্ষক নিয়োগের জন্য কমিশন জোর সুপারিশ রাখে। প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক, প্রশাসক ও পরিদর্শকদের প্রশিক্ষণ এবং গবেষণার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে একটি জাতীয় একাডেমী এবং শিক্ষাক্রম উন্নয়নের জন্য একটি জাতীয় শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপনের সুপরিশ করে। পরবর্তী সময়ে ময়মনসিংহে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী এবং ঢাকায় জাতীয় শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপিত হয়। জাতীয় শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কেন্দ্র পরে বাংলাদেশ পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের সঙ্গে একীভূত যার বর্তমান নাম জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড।

জাতির জনকের উলি-খিত সিদ্ধান্তগুলোর সূত্র ধরে পরবর্তী দশকে প্রাথমিক শিক্ষার বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনে ধারাবাহিকভাবে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এগুলোর মধ্যে প্রধানটি সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন। সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে নতুন বিদ্যালয় গৃহ

নির্মাণসহ পুরাতন বিদ্যালয় সংস্কার, বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ, শিশুদের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

অন্যদিকে দেশের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য একটি দক্ষ প্রশাসন ও ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য ১৯৮২ সালে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর সৃষ্টি করা হয়। অধিদপ্তরের অধীনে বিভাগ, জেলা, থানা, ক্লাষ্টার পর্যায়ের যথাক্রমে উপ-পরিচালক, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, থানা শিক্ষা অফিসার এবং সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার পদ সৃষ্টি করে একটি প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন কাঠামো গড়ে তোলা হয়। এই কাঠামোর সর্বোচ্চ স্তরে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং সর্বনিম্নস্তরে রয়েছে প্রাথমিক বিদ্যালয়।

আবার প্রাথমিক শিক্ষাকে অর্থবহ এবং জীবন উপযোগী করাসহ মানসম্মত শিক্ষার জন্য যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে। যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম অনুসারে রচিত পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে বর্তমানে সারা দেশে প্রাথমিক শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। বিদ্যালয়ে দক্ষতার সঙ্গে শিক্ষাদান করার জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শুধু উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক শিক্ষিকা নিয়োগের ব্যবস্থাই নিশ্চিত করা হয়নি। শিক্ষকদের যোগ্যতা ও কুশলতা বৃদ্ধির জন্যও দেশের ৫৩টি পিটিআইকে আধুনিকীকরণ এবং পিটিআই -এর প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাকে যোগ্যতাভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের আলোকে সংস্কার করাও হয়েছে।

গোটা আশির দশকে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে গৃহীত উল্লিখিত পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ফলে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৯২ সালে দেশে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়। দারিদ্র্যের কারণে যে সমস্ত পিতামাতার ছেলে-মেয়েরা বিদ্যালয়ে আসতে পারে না তাদের শিক্ষার জন্য খাদ্য প্রদানের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। আশা করা যায় ২০০০ সালের মধ্যে ৬-১০ বছর বয়সী শিশুদের ৯৫% বিদ্যালয়ভুক্ত হয়ে ৭০% পাঁচ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ সম্পন্ন করবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৪

অ) সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন:

১. কোন সালে বাংলাদেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করা হয়?
ক. ১৯৭২ সালে
খ. ১৯৭৩ ,,
গ. ১৯৭৪ ,,
ঘ. ১৯৭৫ ,,।

২. কোনটি স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম শিক্ষা কমিশন নামে পরিচিত?
ক. ড. কুদরাত-এ-খুদা কশিশন
খ. ড. মফিজ উদ্দিন কমিশন
গ. ড. মজিদ কমিশন
ঘ. ড. শামসুল হক কমিশন।

৩. ড. কুদরাত-এ-খুদা কমিশন ১৯৮৩ সাল থেকে প্রাথমিক শিক্ষাকে কত বছর মেয়াদী করার সুপারিশ করে?
ক. ৬ বছর
খ. ৭ ,,
গ. ৮ ,,
ঘ. ৯ ,,।

৪. ১৯৮০ সালে বাংলাদেশে কোন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হয়?
ক. অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা
খ. সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা
গ. বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা
ঘ. সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা।

৫. বাংলাদেশে মোট কতটি পিটিআই রয়েছে?
ক. ৫৩ টি
খ. ৫৪ টি
গ. ৫৫ টি
ঘ. ৫৬ টি।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন:

১. ড. কুদরাত-এ-খুদা কমিশন রিপোর্ট কত সালে প্রকাশ করা হয়?
২. ড. কুদরাত-এ-খুদা কমিশন প্রাথমিক শিক্ষাক্রমে কোন কোন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করেন?
৩. স্বাধীন বাংলাদেশে কত সাল থেকে নতুন শিক্ষাক্রম অনুসারে প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে শিক্ষাদান শুরু হয়?
৪. বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন কাঠামোর সর্বোচ্চ স্তরের দপ্তরটির নাম বলুন?
৫. বাংলাদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কত সাল থেকে চালু করা হয়েছে?

পাঠ ১.৫

বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা: বিশেষ দিকসমূহ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান অবস্থার বিশেষ দিকগুলো বর্ণনা করতে পারবেন;
- প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার কাঠামো বিন্যাস করতে পারবেন;

আশি এবং নব্বই এই দুই দশকে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে যুগান্তকারী অগ্রগতি এবং বিকাশ ঘটেছে। সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাও এই সময়ে বাংলাদেশে প্রবর্তন করা হয়। এই দুই দশক সময়ের মধ্যে বিদ্যালয় থেকে কেন্দ্রিয় পর্যায় পর্যন্ত জালের মত প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা ও পরিদর্শন কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনগণের সহযোগিতা ও অংশগ্রহণের নিমিত্তে এসএমসি গঠন ও তার দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ করা হয়েছে। বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণ ও মেরামতসহ আসবাবপত্র এবং শিক্ষাপোকরণ সরবরাহ করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষাকে আকর্ষণীয় করার জন্য বিনামূল্যে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণীর শিশুদের পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়েছে। সীমিতভাবে হলেও দরিদ্র শিশুর পিতা মাতাদের সহায়তা করার জন্য শিক্ষার জন্য শিশুদের খাদ্যও প্রদান করা হচ্ছে।

অন্যদিকে শিক্ষাকে অর্থবহ এবং জীবনোপযোগী করার জন্য শিক্ষাক্রম সংস্কার, পাঠ্যপুস্তক নবায়ন এবং শিক্ষক শিক্ষণের জন্য দেশের ৫৩টি পিটিআই কে সংস্কার করা হয়েছে। তদুপরি শিক্ষক প্রশিক্ষণকে বিদ্যালয় পর্যায়ে বিকেন্দ্রিভূত করে সাবক্লাষ্টার প্রশিক্ষণ এবং নিবিড় বিদ্যালয় পরিদর্শনের ব্যবস্থা এই দুই দশক সময়ের মধ্যেই চালু করা হয়েছে। এসব সংস্কার কার্যক্রমের ফলে বিদ্যালয়ে শিশু ভর্তির হার বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ৯০% ভাগ অতিক্রম করেছে। পাশাপাশি বালিকাদের সংখ্যাও ৪৭% ভাগের বেশি হয়েছে। অন্যদিকে পাঁচ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তকারীর সংখ্যা যেমন ৬০% পৌঁছেছে তেমনি ঝরে পড়ার হারও ৫০% নিচে এসেছে।

বিদ্যালয়ে শিশু ভর্তির সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সংগতি রেখে দেশে নতুন সরকারী বিদ্যালয় স্থাপনের পাশাপাশি বেসরকারী পর্যায়ে এবং সরকারী অর্থানুকূল্যে বহু প্রাথমিক বিদ্যালয়ও স্থাপন করা হয়েছে। সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাথমিক বিদ্যালয় সংখ্যা বর্তমানে ৮০,০০০ এর ওপরে। বলা যায় প্রাথমিক শিক্ষার একটি অবকাঠামো দেশে নির্মিত হয়েছে। ফলে প্রাথমিক শিক্ষার পরিমাণগত লক্ষ্য মোটামুটি অর্জিত হয়েছে সত্য। কিন্তু গুণগত মানের দিক থেকে প্রাথমিক শিক্ষা অনেক পশ্চাৎপদ অবস্থায় রয়েছে। আবার সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় দেশের ১০০% শিশুকে অন্তর্ভুক্ত করতে চাইলে মানসিক ও শারীরিক দিক থেকে প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থার কথা চিন্তা করতে হবে। প্রায় সব দেশে এ ধরনের শিশুর সংখ্যা ১%-২.৫% এর মধ্যেই থাকে। বাংলাদেশেও প্রতিবন্ধী শিশু রয়েছে। সাধারণ শিশুদের সঙ্গে একই বিদ্যালয়ে এদের শিক্ষার ব্যবস্থা সম্ভব নয়। বিশেষ ধরনের বিদ্যালয় স্থাপন করে এদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা না গেলে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হবে না।

যুগ ও সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে শিক্ষার চাহিদার পরিবর্তনও অনিবার্য। বর্তমানের পাঁচ বছরের প্রাথমিক শিক্ষাকে এখন আর যুগোপযোগী মনে করা হচ্ছে না। ১৯৫১ সালের আকরাম খান শিক্ষা

কমিশন থেকে শুরু করে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রায় সকল কমিশনই প্রাথমিক শিক্ষাকে আট বছর মেয়াদি করার সুপারিশ করেছে। বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী দেশ, থাইল্যান্ড ও মালয়েশিয়ার প্রাথমিক শিক্ষা ছয় বছরের।

দেশের ৮০০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এখনও বিপুল সংখ্যক শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিহীন রয়েছে, এদের সংখ্যা এক লক্ষেরও ওপরে। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের সঙ্গে মানসম্মত শিক্ষার সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। অথচ দেশের ৫৩টি পিটিআই একত্রে বছরে সর্বোচ্চ ১০,০০০ শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দিতে পারে। এ হিসেবে প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিতে কমপক্ষে ১০-১২ বছর অপেক্ষা করতে হবে। এক্ষেত্রে বিকল্প প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা উদ্ভাবন একান্ত জরুরি। অন্যদিকে নিবিড় বিদ্যালয় পরিদর্শন ও স্থানীয় পর্যায়ে চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণদানের জন্য সাবক্লাষ্টার পর্যায়ে যে ২১০০ এর মত সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার রয়েছেন, তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। নিবিড় পরিদর্শনের জন্য এই সংখ্যা ৮০০০ এ উন্নীত করা প্রয়োজন। মানসম্মত শিক্ষার একটি অন্যতম উপাদান শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত। বাংলাদেশের এই অনুপাত ১ঃ৭০। মানসম্মত শিক্ষার জন্য ১ঃ৪০ শিক্ষক ছাত্র অনুপাত অনুকূল হয়। উল্লিখিত সমস্যাগুলো সমাধানের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার সাফল্য নিহিত।

বাংলাদেশ ১৯৯৭-২০০১ সালের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:

১. বিদ্যালয় গমনোপযোগী শিশুর ৯৫% নীট ভর্তির হার নিশ্চিত করা।

২. ৭০% ভর্তিকৃত শিশু প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপ্তিকরণ।

৩. বর্তমান বিদ্যালয় অবস্থানকালের পরিমাণ বৃদ্ধি।

৪. শিক্ষক ছাত্র অনুপাত ১ঃ৪০ স্তরে আনার জন্য শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং বিদ্যালয়গৃহ সম্প্রসারণ।

৫. বিদ্যালয় পরিদর্শন জোরদারকরণের লক্ষ্যে ক্লাষ্টার পর্যায়ে পরিদর্শকের সংখ্যা বৃদ্ধি।

৬. প্রতিটি গ্রামের জন্য একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় নিশ্চিতকরণ।

৭. প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা বিকেন্দ্রিকরণ।

৮. প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য বিশেষ শিক্ষার প্রবর্তন।

৯. প্রচলিত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার পাশাপাশি দূর শিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষকদের খুব কম সময়ের মধ্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।

১০. দুই হাজার সালের পর প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদকে আট বছর করণ।

বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার বাংলাদেশের জন্য একটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন করার জন্য ড. শামসুল হক এর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেন। কমিটি ইতোমধ্যে তার রিপোর্ট সরকারের নিকট পেশ করেছে। তাই রিপোর্ট গৃহীত এবং বাস্তবায়িত হলে দেশের প্রাথমিক শিক্ষা এবং শিক্ষা ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ রূপরেখা সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৫

অ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষার জন্য খাদ্য কেন দেওয়া হচ্ছে?
২. বর্তমানে শিশু ভর্তির হার কত?
৩. বাংলাদেশে এখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা কত?
৪. বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী কোন কোন দেশে প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ কত বছর?
৫. প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষকদের সকলকে প্রশিক্ষণ দিতে কত বছর সময় প্রয়োজন?

আ) শূন্যস্থান পূরণ করুন

১. প্রায় সকল দেশে মোটামুটি .....শিশু প্রতিবন্ধী থাকে।
২. ১৯৯৭-২০০১ সালের পরিকল্পনায় বিদ্যালয় গমনোপযোগী শিশুর ভর্তি হার .....নিশ্চিত করা হবে।
৩. প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার জন্য .....ধরনের বিদ্যালয় স্থাপন প্রয়োজন।
৪. শিক্ষক ছাত্র অনুপাত ১ঃ৪০ স্তরে আনতে হলে শিক্ষক সংখ্যা .....করতে হবে।
৫. মানসম্মত শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় ঘণ্টার পরিমাণ .....করা প্রয়োজন।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

অ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. বৌদ্ধ শিক্ষার অষ্টমার উপাদানগুলো কি?
২. মক্তবে সাধারণত কি শিক্ষা দেওয়া হত?
৩. মনিটরিয়াল শিক্ষা পদ্ধতি কি?
৪. বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন কাঠামোর সর্বোচ্চ স্তরের দপ্তর কোনটি?

আ) সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন

১. বেদ বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ।
২. লর্ড কার্জন মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা করেন।
৩. নির্বানলাভ হিন্দু ধর্মের প্রধান লক্ষ্য ছিল।
৪. শিক্ষক ছাত্র অনুপাত মানসম্মত শিক্ষার একটি অন্যতম উপাদান।
৫. ১৯৯৭-২০০১ সালের পরিকল্প সময়ের মধ্যে ৭০% শিশু প্রাথমিক শিক্ষাচক্র নিশ্চিত করা হবে।

ই) শূন্যস্থান পূরণ করুন

১. প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল ..... কেন্দ্রিক।
২. বাংলা ও বিহারে মোট ..... দেশীয় প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল।
৩. .....কমিশন প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের মেয়াদ এক বছরের স্থলে দুই বছর করার সুপারিশ করেন।
৪. .....সালে বাংলাদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হয়।
৫. ১৯৯৭-২০০১ সালের পরিকল্পিত সময়ের মধ্যে বিদ্যালয়ে শিশু ভর্তির হার ..... নিশ্চিত করা হবে।